একটি সাম্প্রতিক কাব্য-গ্রন্থ। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার-দত্তের আমি অনুরাগী পাঠক। তাঁর কবিতা আমার ভালো লাগে। কোন্ পত্রিকার পাতায় মনে নেই, একটি মিষ্টি কবিতা পড়ে প্রথম শ্রীযুক্ত দত্তের প্রতি আমি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। আমি সানন্দে জানাতে পারি, সেই প্রথম ভালো লাগা আজও আমার অব্যাহত—যেমন হয়েছে শ্রীযুক্ত রাম বসু, শ্রীযুক্ত অলোকরঞ্জন দাশ গুপ্ত আর শ্রীযুক্ত শঙ্খ ঘোষের ক্ষেত্রেও।

প্রফুল্লকুমারের 'এই অন্ধকার-আলো' তাঁর অনেক ক'টি সুনির্বাচিত কবিতাকে এক সঙ্গে এনে দিয়েছে। পরম আনন্দে কবিতাগুলোকে পড়ে ফেললাম। প্রায় প্রত্যেকটি কবিতাই লিরিকের নিটোল বৃত্তে বাঁধা, সুগভীর চেতনায় সঞ্জীবিত, অস্তিবাদী জীবন-প্রতীতিতে উজ্জ্বল। অন্ধকারের যন্ত্রণা নিশ্চয়ই আছে, এই যুগের প্রেক্ষাপটে তা অনস্বীকার্য এবং অবশ্যম্ভাবী, তবু 'দেহের গলিত শবে'ও 'সূর্যমুখী চেতনা' কবিকে 'বাঁচার মহৎ পথের' কথা ভুলতে দেয়নি, তিনি বলতে পারেন :

> এই অন্ধকার-আলো যাকে জন্ম দেবে যন্ত্রণায়—
> সে শান্তি, সমগ্র সত্তা আছে তার লুব্ধ-প্রতীক্ষায়।

কবিতাগুলো পড়তে গিয়ে পাঠক হিসাবে প্রফুল্লকুমারের কয়েকটি নিজস্ব চোখে পড়ল—যে-গুলোকে তাঁর কাব্য-চরিত্রের পরিচয় বলতে পারি। সব চাইতে বড়ো জিনিস তাঁর স্বাভাবসিদ্ধ সংযম, যার ফলে প্রতিটি কবিতা একটি সুমিত বৃত্তের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত এবং ভালো লিরিকের যা প্রাণধর্ম—নিবিড় ভাবে সংহত হয়েও ব্যাপ্তিতে জ্যোতির্ময়, সেই মৌল-বিচারে প্রথমেই সমুত্তীর্ণ। উদ্ধৃতির বাহুল্য ঘটাতে চাইনা, পাঠকের জন্যে সমগ্র বইটিই রইল, আমি শুধু 'পুতুল খেলা'র শেষ তিনটি লাইন স্মরণ করিয়ে দিই :

> মেয়েটির বাবা খেলা করছেন, খেলা করবেন ;
> মা খেলনাগুলো তুলে রাখছেন, তুলে রাখবেন :
> বাবা আবার সেগুলো নামিয়ে খেলা করবেন।

দ্বিতীয়ত তাঁর কবিতায় একটি স্বচ্ছ-ঋজুতা আছে যা এ-কালের

কবিতায় ক্রমশ দুর্লভ হয়ে উঠে নৈষ্ঠিক কাব্যপাঠককেও নিরুৎসাহ করে তুলছে। কবিতায় কবি-ব্যক্তিত্ব চূড়ান্তভাবে প্রকটিত হোক, তাঁর বুদ্ধি কিংবা চেতনার বিশেষ রঞ্জনে কবিতা রঞ্জিত হোক, নিজস্ব ভাষা-বন্ধে এবং প্রতীক-বিন্যাসে তা স্বয়ংদীপ্ত হয়ে উঠুক ; কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে প্রতীক দুর্বোধ্য সাংকেতিকতায় ধূসর হয়ে যাক, কবিতা এমন ব্যক্তিগত হোক যে পাঠকের পক্ষে তার প্রবেশদ্বারটি হোক অনধিগম্য, কবি-ব্যক্তিত্ব নিজেকে ঘিরে আত্মপরতার একটা দুরতিক্রমণীয় প্রাচীর তুলে দিকে। প্রফুল্লকুমারের শিল্পিসত্তা এদিক থেকে নির্দয় নয়। ব্যক্তিত্বের পূর্ণ পরিচয় রেখেও তিনি আমাদের জন্যে দ্বার রুদ্ধ করেননি, তাঁব শিল্প-জগতে আমরাও সহযাত্রায় অংশ নিতে পারি। প্রফুল্লকুমারের কাছে আমাদের সব চাইতে বড়ো কৃতজ্ঞতা এই খানেই।

তৃতীয়ত মনে হয়েছে, তাঁর প্রতীক-চিত্রকল্পে একটা সহজ অনিবার্যতা আছে। তারা আহরিত নয়, কবিতার আবরণ-আভরণও নয়, স্বসমুখ। একেই বোধ হয় বলে প্রসাদগুণ। 'এই অন্ধকার-আলো' সেই প্রসাদগুণে, সহজাত শোভনতায়, পাঠকমনকে পরিতৃপ্ত করে—কবির সম্পর্কে প্রত্যাশাকে উজ্জ্বলতর করে তোলে।

ভালো কবিতা এই বইতে অনেক আছে, একটি সুদীর্ঘ তালিকা করা যায়। অমি সে চেষ্টা করবনা। আমি মাত্র 'দুই পৃথিবী', 'পুতুল খেলা', 'তিনটি শিশুর মা ও চতুর্থ যুবক' এবং 'অন্ধকার ঘরেব কোণে'র কথা বলব—কবির মনন আর শক্তিকে বোঝবার জন্যে এই চারটি কবিতার নিরিখই যথেষ্ট।

সর্বশেষ একটি কথা। প্রকাশিকার ভূমিকাটি আমার ভালো লাগেনি দুটি কারণে। কী দরকার ছিল এই ভাবে পরিচিতি দেবার? দ্বিতীয় কথা, দুটি পত্রিকার ওপরই বা এই অভিমান কেন? প্রফুল্লকুমাব নিজের জোরেই দাঁড়াবেন, কোনো বিশেষ পত্র-পত্রিকার স্বীকৃতি-অস্বীকৃতির প্রশ্ন তুলে এই ধরণের ছেলেমানুষি ক্ষোভের কোনো প্রয়োজন ছিলনা ॥

এই অন্ধকার-আলো । প্রফুল্লকুমার দত্ত

আধুনিক কবিতা প্রকাশনী
এক, মিডল রোড, কলকাতা-বত্রিশ
মূল্য : আড়াই টাকা।

প্রকাশিকার কথা

কবি প্রফুল্লকুমার দত্তের 'এই অন্ধকার-আলো' পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পারায় আজ আমরা আনন্দিত। উনিশশো বাহান্ন-চুয়ান্ন সালের রচনা থেকে কবির প্রথম কাব্য-গ্রন্থ 'পঁচিশে বৈশাখ' প্রকাশিত হয়েছিল উনিশশো পঞ্চান্ন সালের এপ্রিলে, আর, কবির নিজস্ব স্বীকৃতিতেই, তা ছিল অপরিণত হাতের রচনা। কিন্তু তারপর সুদীর্ঘ ন'বছর অতিবাহিত। ইতিমধ্যে অজস্র পত্র-পত্রিকা ও সংকলনে কবির প্রচুর মৌলিক কবিতা, অনুবাদ-কবিতা ও কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। অথচ, নানা কারণে পরবর্তী কালের পরিণত রচনার কোনো কাব্য-গ্রন্থই প্রকাশ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এখানে, শুধু উনিশশো একষট্টি-তেষট্টির মধ্যে রচিত কবিতাগুলির মধ্য থেকে মাত্র চুয়ান্নটি কবিতা বেছে নিয়ে এই গ্রন্থ সংকলিত হল। সুতরাং অপরিণত হাতের রচনা থেকে পরিণত হাতের রচনার যে বিস্ময়কর ব্যবধান তা নিশ্চয়ই পাঠকদের দৃষ্টি এড়াবেনা। কবিতার বহুমুখী পরীক্ষা-নিরীক্ষার আশ্চর্য সফলতায়, ভাববৈচিত্র্যের ও ছন্দোবৈচিত্র্যের বৈশিষ্ট্যে এ-গ্রন্থের প্রত্যেকটি কবিতাই উল্লেখযোগ্য। বলা বাহুল্য, উনিশশো পঞ্চান্ন সাল থেকে ষাট সাল পর্যন্ত রচিত কবির আরো অজস্র কবিতা রয়ে গেল, যা সময়ান্তরে একাধিক সংকলনে প্রকাশ করার পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে।

– প্রফুল্লকুমার দত্ত প্রসঙ্গে বর্তমান সুযোগে আর একটি কথা প্রকাশ্য ভাবেই বলবার প্রয়োজন বোধ করছি। বাংলা দেশের দুটি উল্লেখযোগ্য সাপ্তাহিক পত্রিকায় আজও লক্ষণীয়ভাবে এই কবির কবিতা অনুপস্থিত। এবং কেন অনুপস্থিত, কবিকে বহুবার এই কূট-প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। কারণটি সহজেই অনুমেয়। সম্পাদকীয় দপ্তরে আর সাহিত্যক্ষেত্রে আমলাতন্ত্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কোনো অভিনব ঘটনা নয়। এর আগেও বহু প্রতিভাবান কবি-সাহিত্যিক এই ঘৃণ্য আমলাতন্ত্রের নিরুপায় শিকার হয়েছেন। বর্তমান কবি প্রফুল্লকুমার দত্তের ক্ষেত্রেও সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে, এই মাত্র। তাই, কিছু দিন আগেও জনৈক তরুণ কবি যখন উক্ত পত্রিকা দুটির নাম করে কবিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে ও-দুটি পত্রিকায় তিনি লেখেন না কেন, তখন কবি নির্লিপ্তভাবেই বলেছিলেন—'লিখিনা, তা ঠিক নয়; আসলে ওঁরা আমার লেখা ছাপেন না। অবশ্য সে-জন্য আমার সাধনা বিন্দুমাত্র

ব্যাহত হয়নি! গত বারো বছরে বহু পত্র-পত্রিকা ও সংকলনে আমার প্রচুর কবিতা নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়েছে।'

সেদিনের সেই সংক্ষিপ্ত ভাষণটুকু, সেখানে উপস্থিত আমাদের সকলকেই নাড়া দিয়েছিল। পরে যখন আমরা কবির সাম্প্রতিক একটি কাব্য-গ্রন্থ প্রকাশনায় সচেষ্ট হলাম তখন যে অর্দ্ধশতাধিক পত্র-পত্রিকা ও সংকলনের সম্মুখীন হতে হল, তাদের মধ্যে যে ক'টি একান্তভাবেই উল্লেখযোগ্য, তা হচ্ছে—অনুক্ত (সুনীলকুমার নন্দী), আধুনিক কবিতা (রেখা দত্ত), উত্তরণ (কিরণশঙ্কর সেন গুপ্ত), একক (শুদ্ধসত্ত্ব বসু), কবিতা (বুদ্ধদেব বসু), কবি-পত্র (সমরেন্দ্র সেন গুপ্ত), কৃত্তিবাস (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়), গঙ্গোত্রী (দুর্গাদাস সরকার), জন সেবক, জয়শ্রী (লীলা রায়), তরুণের স্বপ্ন (মালবিকা দত্ত), ধ্রুপদী (সুশীল রায়), নক্ষেত্রের রাত (সামসুল হক), পঁচিশ জন সাম্প্রতিক কবি (দিনেশ দাস), বসুধারা (চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য), বাংলা কবিতা (শান্তি লাহিড়ী), মধুরাংশু (দক্ষিণারঞ্জন বসু), ময়ূরপংখী (বন্দেআলী মিয়া : পূর্ব পাকিস্তান), মাসিক বসুমতী (প্রাণতোষ ঘটক), মেদিনীপুর কথা (আজহারউদ্দিন খান), যুগান্তর, রবীন্দ্র-ভারতী (অমল ঘোষ : মাদ্রাজ), লোক সেবক, শতভিষা (আলোক সরকার) সমকালীন (আনন্দগোপাল সেন গুপ্ত), সাপ্তাহিক কথাবার্তা (প্রকাশস্বরূপ মাথুর), সাপ্তাহিক বসুমতী (প্রেমেন্দ্র মিত্র), সাপ্তাহিক ভারতজ্যোতি (শৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ), সাহিত্য তীর্থ (রমেন্দ্র মল্লিক), সাহিত্য-পত্র (বিষ্ণু দে) প্রভৃতি। সুতরাং আমরাও মনে করি যে পূর্বোক্ত সাপ্তাহিক পত্রিকা দুটিতে লেখা প্রকাশিত না হলেও কবির 'সাধনা বিন্দুমাত্র ব্যাহত হয়নি'—তিনি আজ বাংলা দেশের লেখক এবং পাঠক মহলে সুপরিচিত। আর, তাঁর এ-কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ যে বাংলা কবিতা পাঠকদের কাছে বহু প্রতীক্ষিত, সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

এই গ্রন্থ প্রকাশনায় ঐকান্তিকভাবে উৎসাহিত করেছেন, সর্বশ্রী নলিনীকান্ত চক্রবর্তী, জ্যোতিষচন্দ্র সেন গুপ্ত, রঞ্জিতাশ্ম মণ্ডল, শান্তিপ্রকাশ সরকার, ডানিয়েল কম্বুলনা, অমরনাথ পাল, হরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, রজনীকান্তি বিশ্বাস, প্রণবকুমার সেন গুপ্ত, বরুণকুমার সেন গুপ্ত, মধুসূদন বর্মন, বিধুভূষণ কুণ্ডু, মৃত্যুঞ্জয় মাইতি, বুদ্ধদেব গুহ, অমর বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃণাল কর গুপ্ত, দেবব্রত দত্ত, অমল চৌধুরী, পাঁচুগোপাল রায় সর্দার ও সুনীল চক্রবর্তী॥

রেখা দত্ত

সূচীপত্র

উৎসর্গ—

মাকে-বাবাকে

প্রফুল্লকুমার দত্তের

প্রথম কাব্য-গ্রন্থ

পঁচিশে বৈশাখ

রচনা-কাল : উনিশশো বাহান্ন-চুয়ান্ন

প্রকাশ-কাল : উনিশশো পঞ্চান্ন

বর্তমানে নিঃশেষিত

রোদ-বৃষ্টি-ঝড়

এ-জীবন পথে-ঘাটে দুহাতে বিলিয়ে
এখন একান্ত ক্লান্ত। ত্রিনয়নময়
অজস্র স্মৃতির কাঁটা রেখেছি বিঁধিয়ে!

এ-ঘরে কালের পদচারণা! বিজয়
অভিযান! আমি একে ঠেকাবো কী দিয়ে!
পরাজিত রন্ধ্রে ব্যর্থ আলোর সঞ্চয়।

*

চেতনা মাথা তোলে অলস অবকাশে—
মনের আবরণে হাজারো জোড়াতালি!
কতো যে অভিমান পেছনে, আশে-পাশে!

আকাশ মেঘময়, জানালা এককালি—
করুণ সন্ধ্যায় যে-আশা চোখে ভাসে
তারও প্রতীক্ষিত প্রণয়ে চোরাবালি!

*

কী হবে, কী হবে প্রচলিত-পথে হেঁটে!
আমি যা জেনেছি, পেয়েছি পৃথিবী ঘুরে,
তা দিয়ে মনের কতোটুকু দাবী মেটে?

প্রলয়ের ঝড়ে সমস্ত যাবে উড়ে!
নব সভ্যতা আবার পাহাড় কেটে
এগোবে, ছড়ানো এ-ফসিল ভেঙে চুরে॥

আত্মকথা

আমিও নিঃশেষ প্রতিপন্ন কি ? স্বগোত্র প্রতিবেশী
অন্যসব প্রতিভার মতো ? এই জিজ্ঞাসার শেষে
উত্তর মেলেনা মনে ; নিজ বৃন্তে নিজে যে বিদেশী—
নির্লজ্জ এ-আভিজাত্যে আত্মা কাঁদে ভিখিরীর বেশে

আমিও নিঃশেষ প্রতিপন্ন কি ? স্বদম্ভে কেন তবে
দুর্বিসহ এ-জীবন অহেতুক বয়ে মরি আর ?
সীমিত সংসারে নানা আবর্জনা বাড়িয়ে কী হবে—
যদি শেষ হয়ে থাকে সব কথা, যা ছিল বলার।

আমিও নিঃশেষ প্রতিপন্ন কি ? নির্মম এই কথা
কী করে বিশ্বাস করি ! সম্রাটের সমারোহ নিয়ে
বেঁচে থাকতে কে না-চায় ? দুঃসহ আমৃত্যু নীরবতা —
দধীচি-আত্মার শান্তি, অন্তে অস্থি দেবতাকে দিয়ে !

আমিও নিঃশেষ প্রতিপন্ন কি ? অথচ ভুলিনি তো—
অমৃতের পুত্র আমি, নিষ্কম্প প্রদীপশিখা হাতে ;
বাউলের মতো আজো যে সংগীতে আত্মভোলা, প্রীত—
তার প্রেমে সাড়া দেবো প্রত্যাসন্ন অন্ধকার রাতে ॥

জন্ম-লগ্ন

এ-জাতক জন্ম নিলে আর দু'দণ্ড আগে,
রাজা হোত : গ্রহ-নক্ষত্রের কানাকানি :
শুভ-লগ্নে জন্ম দিতে মা যার না-জাগে
সে কোন্ সুযোগে পাবে রাজ্য, পাটরানী ?

বিলম্বে আসার ফলে দীর্ঘ ইতিহাস
জান্তে হবে ; পেতে হবে বেশী দুঃখ, শোক—
নিজের সমাধি নিজে তৈরীর বিলাস
আমরণ বস্ত কর্‌বে অভাগা জাতক।

হৃদয় রাজ্যের রাজা রাখাল ! অকাল
বসন্তে অন্তরে রানী রাধা : সুদর্শন
চক্র, পাঞ্চজন্য, শিখিপুচ্ছকে বহাল
রেখেছে—বেঁধেছে কাল-পুরুষের মন।

জন্ম-লগ্ন আপেক্ষিক। জননী নির্দোষ,
সৃজন দাক্ষিণ্যে যার পূর্ণ বিশ্বকোষ ॥

অমৃত

সমুদ্র মন্থনে দেবাসুর মত্ত ;
যা উঠেছে, সবই মহারথী-করায়ত্ত !
কে কী পাবে আর পাবে না, এ-নিয়ে দ্বন্দ্ব
ঈর্ষায় জ্বলে গৃহ-সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য !

স্বেচ্ছাচারী ও অন্ধ অসুর বংশ
অমৃতের ছোঁয়া পেলে তো হবে না ধ্বংস
চক্রীর তাই কী যে অদ্ভুত কাণ্ড,
মোহিনীর বেশে নিল অমৃতের ভাণ্ড !

অমরত্বের দুরাকাংক্ষায়, গর্বে—
দেখেনি তো কেউ, কী জমেছে শেষ-পর্বে :
বাসুকির বিষে সমুদ্র নীল-বর্ণ ;
পাবেনা রেহাই উত্তম, অধমর্ণ !

বিষের প্লাবনে থরহরি রাধা-কেষ্ট।
ভয় কী ? শিবের বংশজ যোগী শ্রেষ্ঠ,
কবি স্বেচ্ছায় নেবে সব বিষ কণ্ঠে—
সম্বিত ফিরে পাবে এবং এক দণ্ডে ॥

শিবালিক

ওপরে সৌন্দর্য খেলে ঢেউ,
ভেতরে দুর্বোধ্য নীরবতা ;
আত্মার একান্তে নেই কেউ—
ওপরে-ভেতরে কতো কথা !

সংকীর্ণ পথের বাঁকে ব্যথা,
সমুদ্রে ঝড়ের পূর্বাভাস ;
সংযমের আব্রু টেনে একা
সে যেন ঘুমন্ত বারোমাস !

এ-যুগে বন্ধন নেই তার,
জাত-কুল-মান-ধর্মবোধ—
সমস্ত মিলিয়ে দু'সংসার
অন্নময় রূঢ় অববোধ !

দৃশ্যান্তে প্রেমের বুকে কাম,
সহজিয়া, কী অস্বাভাবিক !
আর্য-অভিশাপে, ত্যাখো রাম,
অহল্যা সার্থক শিবালিক ॥

অন্তিম সঞ্চয়

নানা চিন্তা ভেসে আসছে পুরোনো স্রোতের সমাহারে—
ফুল, পাতা ও আবর্জনা : সুন্দরী মহিলা, ভালোবাসা,
সংশয়, বিদ্বেষ, ধ্রুব তারার সন্ধান অন্ধকারে।

আশ্রিতের নিরাপত্তা, ব্রহ্মাণ্ড, মৃত্যুর পরিভাষা
জানবার ব্যগ্রতা, গৃহলক্ষ্মীর ভাণ্ডারে চুপিসারে
হস্তক্ষেপ ; কী দিয়ে কী করবো—আরো কতো কী দুরাশা !

নদীর মৃত্যুর আগে এ-স্রোতের নেই অবসান—
দুকূলে বালির স্তূপ অথচ মানছেনা পরাজয়,
ক্ষীণতর প্রবাহের পুরোভাগে সমুদ্র-আহ্বান।

আশ্চর্য, জীবন জুড়ে সীমাহীন ব্যথার বিস্ময়
স্মরণীয়, বরণীয় ফুল, পাতা ও আবর্জনা—প্রাণ
বাঁচেনা যে পলি ছাড়া, সে এদেরই অন্তিম সঞ্চয়॥

সার্কাস

আগুন নিয়ে খেলা করার সাধ
জলন্ত, আর চাবুক হাতে একা
দশটা বাঘের খাঁচায় বিসম্বাদ—
মৃত্যু-সুধা নিত্য চেখে দ্যাখা !

জাড়াটে সব ভাঁড়ের চোখে জল,
হাসায় তবু অদ্ভুত নাচ নেচে ,
মানুষ, পশু একত্র সম্বল—
দর্শকেরা দর্শনী দেয় বেচে ।

জীবনগুলো বিকোয় মাটির দামে ,
চোখের কোণে হিংস্র আগুন জেলে
আমায় ডাকো গোপন কোনো নামে—
দিন যায় প্রাণান্ত খেলা খেলে !

আগুন নিয়ন্ত্রিত ! বাঘের দল
প্রেম-পিয়াসী, চাবুকে চঞ্চল ॥

ত্রিবিধ

আহার, নিদ্রা, মৈথুন—এই
জীবন-সত্যে ভণ্ডামী নেই;
এ-তিন মুদ্রা উৎসাবিত সব :
বিদ্যা, বুদ্ধি বা বিক্রম,
শৌর্য, বীর্য আর উদ্যম—
মোটের ওপর যা কিছু বৈভব।

ধর্ম, অর্থ, মোক্ষ ও কাম—
এইখানেই শেষ পরিণাম :
এই তিনে আবদ্ধ আছে যতো
প্রাণ-প্রবাহের আদিম লীলা—
অন্ধকারে সব মহিলা
উর্বশী ও তিলোত্তমার মতো।

এ-সত্যটি চক্ষু খুলে
দেখার পরে, জগৎ ভুলে
থাকবে আবার কোন্ ভীষ্মদেব!
জন্মদাতার আশীর্বাদে
জন্ম নিয়ে, গুপ্ত-ফাঁদে
সব শর্মা আটকে আছে ব্রেক্‌॥

ভগীরথ

সহজ পন্থায় আর বেঁচে থাকতে দেবেনা এ-যুগ।
সুনিপুণ যন্ত্রণায়, বিজ্ঞতম নিষ্পেষণে ক্রমে
কখন ফসিল হয় কিশলয়! কঠিন অসুখ,
স্বচ্ছন্দ দুরভিসন্ধি সংক্রামিত কামজ বিভ্রমে।

অর্জিত শোভন শান্তি বিপর্যস্ত সর্বদা। মসৃণ
চোরকাঁটা কুমারী-আব্রু, কলংক রটাতে সহগামী;
কী আশ্চর্য! সায়নেড সঞ্চিত সংসারে রাত্রি-দিন
মৃত্যুর মধুরতম সংগমে বঞ্চিত মৃত্যুকামী!

প্রাণ-কেন্দ্রী শিশুর কণ্ঠ বিকশিত হবেনা বাগানে—
হবেনা নির্বিঘ্ন মনে অন্য মনে আত্মসমর্পণ!
কী নিয়ে বাঁচার সাধ? নির্বিবাদে প্রজ্ঞা হার মানে
পশুর নখাগ্রে : শেষ শান্তির প্রতিমা বিসর্জন।

গঙ্গায় অজস্র ঢেউ; কূলে কূলে জ্বলন্ত জগৎ—
শান্তির, মুক্তির ধারা স্তব্ধ, ব্যর্থ যোগী-ভগীরথ!!

ভক্তি-বিনিময়ে

অংগে তুমি যে হিল্লোল এনেছো রঙ্গিনী, আমি তার
স্পর্শে মুগ্ধ, অনুরক্ত ; নিজেকে যখনই বিমোহিত
করেছি, সংস্কৃত পথে—মন্দির-মস্‌জিদ-গীর্জা-স্থিত
প্রত্যয়ে দেখেছি, তুমি দেবীর বেদীতে একাকার !

যা শাশ্বত, যা সুন্দর—তা স্বয়ম্ভূ ! এই হিমাচল
সত্তার গভীরে আদি গঙ্গার সংগীত। আলো-ছায়া,
জন্ম-মৃত্যু, প্রেম-কাম, ঈশ্বর-ঈশ্বরী, মুক্তি-মায়া—
সমস্ত অনন্ত সত্যে তুমি পবিত্রতায় উজ্জ্বল !

আমার তৃতীয় চোখ, সঙ্গিনী, তোমার চোখে স্থির ;
তার উৎসারিত আলো সংসারে আনন্দময় ধারা
প্রবাহিত কোরে চলে। আহা, তবু তোমার কিনারা
না পেয়ে ধ্যানস্থ আমি—হিল্লোলিত তোমার শরীর
জড়ালে জটার জালে, কী কোরে বেরুবে বিশ্বজয়ে ?
যে শক্তি তোমার উৎস, পেয়েছি তা ভক্তি-বিনিময়ে।

মহীরুহ

সে আসবে প্রশস্ত পথে নেমে,
আমি তার সমস্ত জঞ্জাল
নিঃশব্দে সরিয়ে রাখ্ছি—প্রেমে
সে ছোঁবে এ-ভয়াল কঙ্কাল!

হাজার জন্মের কোনো ফাঁকে,
সান্ত্বনা এবং ছায়া দিতে,
সে এসে পথের শেষ-বাঁকে
দুদণ্ড দাঁড়াবে অতর্কিতে।

ধরিত্রী সোমত্ত! মনোসিজ,
এবার কামজ পুষ্প-শরে
জর্জরিত করো, সুপ্ত বীজ
ঝরুক মাটির ঘরে ঘরে!

অনাগত সত্তা ভালোবেসে
দুহাতে ভাঙছি মৃত্যু ব্যূহ,
আর্ত-প্রত্যাশায় রাত্রি-শেষে
ক্রমশ প্রত্যক্ষ মহীরুহ॥

সংক্রমিত

সকালবেলা চোখ মেলে যে পরিবেশের সাথে
বিরক্তিময় প্রথম পরিচয়—
তার কবলে চাস্‌নি ধরা দিতে।
দুপুর গেছে, সন্ধ্যে গেল, এখন মধ্যরাতে
প্রদীপ জ্বালার অনন্ত বিস্ময়
মনকে নাড়া দিচ্ছে আচম্বিতে!

ছোট্ট ঘরে প্রদীপ শিখা জ্বলছে এঁকে-বেঁকে,
সামনে জীবন—আলিঙ্গনের ঢঙে
হাত বাড়িয়ে ডাকে ; আকর্ষণ
তীব্রতর! মৃত্যু জড়ায় পায়ে পেছন থেকে ;
প্রাণের জোরে এবং মনের রঙে
জয়ী হওয়ার ধনুর্ভঙ্গ পণ!

সকাল, দুপুর, সন্ধ্যে, গভীর রাত্রি ; সকাল ফের
আসছে ঘুরে—জাগার পূর্বাভাস :
মন্দিরে মস্‌জিদে বিবর্তিত
কঠিন মন্ত্র উচ্চারণের একক দায়িত্বের
উন্মাদনা ও আত্মবিশ্বাস
তোর মনেও হোক্‌না সংক্রমিত॥

জ্ঞানবৃক্ষ : বিষবৃক্ষ

জ্ঞানবৃক্ষ : বিষবৃক্ষ ! ' স্বর্গ হতে চির নির্বাসন !

পুরুষের মর্মে জ্বলে বিবর্তিত নারকীয় কাম :
আজন্ম নিভৃত কক্ষে সযত্ন-সঞ্চিত মৃত্যু-বাণ ;
জ্ঞানীর নিষ্কৃতি নেই, প্রথমে রাবণ শেষে রাম—
অথচ অমর সেই আদিম বর্বর হনুমান !

লংকাকাণ্ড, কুরুক্ষেত্র, হিরোসিমা, মেরু-বিস্ফোরণ !

অনুসন্ধিৎসা, প্রত্যয় ইত্যাদির অনুষঙ্গ থেকে
আবির্ভূত যে বিজ্ঞান, সে ঘুচায় পৃথিবীর আয়ু !
আপন অস্ত্রের শৌর্যে আপন অস্তিত্ব যায় ঢেকে—
মুহূর্তে নিঃশেষ হয় মানুষের নিশ্বাসের বায়ু !

বিশ্বময় মৃত্যু-বীজ হাজার হাজার মেগাটন !

শেষের সেদিন কতো ভয়ংকর তা জানি ! হিট্‌লার,
আইখ্‌ম্যান, মুসোলীনি অবশ্যম্ভাবী সে-মৃত্যু-ফাঁদে
আবদ্ধ ; অমৃতা পৃথ্বী, বিশল্যকরণী আছে যার,
তার বুকে মানুষেরা আপন কবর খুঁড়ে কাঁদে !

অথচ বাঁচার জন্যে নীল-কণ্ঠ হয় ত্রিলোচন ॥

দুই পৃথিবী

—না,ওপাশে কে বা কারা থাকে, আমি কিছুই জানিনে !
কী ওদের পেশা, নেশা—জানার সুযোগ কই আসে ?
সকালে প্যাঁচানো সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে নেমে যাই। ঋণে
আকণ্ঠ ডুবেছি ! রাত্রে ফিরে শুনি……কী শুনি ওপাশে ?

জীবন-সংগীত ? না কি, লুব্ধ নিষ্পেষণের আভাস ?
না, ওপাশে কী-কী হয়ে থাকে, আমি কিছুই জানিনে !
প্যাঁচানো সিঁড়ির প্যাঁচে শীর্ণ জীবনের নাভিশ্বাস—
ওরা কি দেখেছে ? দৈত্য-পুরীটা ঘুমিয়ে থাকে দিনে !

প্যাঁচানো সিঁড়ির ধাপ সহজ-সরল হত যদি
তাহলে আমি কি আর কবিতার খাতা হাতে নিয়ে
নিজেকে ঋণের দায়ে বিকিয়ে দিতেম নিরবধি ?
না, না, না ! আমিও কিছু শান্তি ফিরে পেতেম ঘুমিয়ে !

ক্রমশ প্যাঁচানো সিঁড়ি—নেমে যাই, ডুবে যাই ঋণে !
—না, ওপাশে কে বা কারা থাকে, আমি কিছুই জানিনে ॥

পুতুল খেলা

হাসপাতাল থেকে খবর এসেছিল—
নিখুঁত নিটোল একটি কুঁড়ির আবির্ভাব ;
এক ঝাঁক শ্বেত শংখের অভিনন্দন !

তারপর গড়িয়ে গেছে আঠারোটা বছর ।

হাসপাতাল থেকে খবর এসেছে—
নিখুঁত সুন্দর ফুলটি অকালে ঝরে পড়েছে ;
এক ঝাঁক করুণ শংখের আর্তনাদ !

এতক্ষণে ইলেকট্রিক চুল্লীতে সে ছাই হয়েছে !

হাসপাতাল থেকে খবর এসেছিল
উদ্বিগ্ন যুবকের ঘরে ; উদ্বিগ্ন প্রৌঢ়ের ঘরে
হাসপাতাল থেকে খবর এসেছে !

দুটি খবরেব মাঝে কতগুলো খেল্না ছড়ানো ।

মেয়েটির বাবা খেলা করছেন, খেলা করবেন;
মা খেল্নাগুলো তুলে রাখছেন, তুলে রাখবেন :
বাবা আবার সেগুলো নামিয়ে খেলা করবেন ॥

উপকরণ

পাথর, নরম মাটি, টুক্‌রো কাঠ, রং ইত্যাদি কতো যে সুষমা
ধারণে সক্ষম !
এই সুবিন্যস্ত ঘরে ওরা কথা বলে ওঠে !
মনের বিচিত্র ভাষা শিখিয়েছি !
অনুভূতি, নিগূঢ় উপমা
আরোপ করেছি যতো তারো বেশী ওতপ্রোত চুলে, চোখে, ঠোঁটে !

এ-তোমার প্রতিচ্ছবি কিংবা প্রতিমূর্তি নয়—আমাব জীবন ;
সৃষ্টির আদিম সত্য !
তুমি একে কোনো দিন চেনোনি সহজে ।
যে প্রদীপশিখা জেলে রেখেছি চেতনাস্তরে
তার বিবর্তন
অনাদ্যন্ত—উৎপীড়িত মানুষেরা সে আলোয় শান্তি, স্থিতি খোঁজে !

তোমাকে পেরিয়ে যেতে, করেছি যে অবিচ্ছিন্ন কতো মেহনত—
পারিনি ;
গড়েছি তাই তিলে-তিলে তিলোত্তমা এ-সৌধ এবং
তোমাকে !
সতিনী ঈর্ষা আমার সমস্ত সুখ, দুঃখ, ভবিষ্যৎ
ঢেকেছে—সম্বল শুধু পাথর, নরম মাটি, টুক্‌রো কাঠ, রং ॥

কর্মী-কবি-দার্শনিক

কর্মী : আমি কি নিষ্ক্রিয় হবো রক্ত-মাংস-লোলুপ সমাজে ?
তীব্রতর আলো জ্বেলে, যোগ করে জীবনে জীবন
পথে পথে ঘুরে ঘুরে পূর্ণ সেতু গঠনের কাজে
আমার বিশ্বস্ত এই ভূমিকার নেই প্রয়োজন !

কবি : আমি কি নিশ্চিন্ত হবো কোলাহল মুখর সংসারে ?
কবিতা সৃষ্টির দায় ঘুচে গেছে ? প্রাণের নির্দেশ,
জীবন-সঙ্গীত আজ অহেতুক ? সবই অন্ধকারে
মজাবো, যতোই হোক জীবন-বিরোধী পরিবেশ ?

দার্শনিক : আমি কি নির্লিপ্ত হবো আত্মঘাতী স্বার্থান্ধ জগতে ?
হৃদয় সম্মত পথে মানব-কল্যাণকামী এই
প্রচেষ্টার প্রয়োজন মিটে গেছে ? পাহাড়ে-পর্বতে
পালাবো, সমাজ-স্বার্থে কিছু আর করণীয় নেই ?

সকলে : কবে যে নিষ্ক্রিয় হবো, নিশ্চিন্ত, নির্লিপ্ত হবো, আর
ঘুমোবো ; গড়াবে কাল, নিরবধি গড়াবে সংসার ॥

বাঁচার মহৎ পথে

বাঁচার মহৎ পথে প্রতি পদক্ষেপে নাজেহাল :
প্রাত্যহিক মোটা-ভাত-কাপড় জোটানো কী যে দায় !
দুখানা প্রশস্ত ঘর, দরজা-জানলা, অক্ষত দেয়াল
মাথার ওপরে ছাত—কী পেলাম জীবদ্দশায় ?

তবুও সৃষ্টির বীজ কতো যত্নে রেখেছি বাঁচিয়ে !
আমার বাঁচার পথ যে-সমাজে হয়নি উদ্ভব,
তাকে কিছু দিয়ে যাবো—এ-সাধু উদ্দেশ্য মেনে নিয়ে
এখনো রয়েছি টিকে, অতি অবহেলিত মানব !

পশুর ধারালো দাঁত, হিংস্র নখ কিংবা তীক্ষ্ণ শিং ,
নারীর কটাক্ষ—কোনো মারণাস্ত্র নেই অধিকারে ;
তীব্রতম যন্ত্রণায় আশুতোষ-প্রসাদী আফিং
নির্লজ্জ সান্ত্বনা দিয়ে আত্মভোলা করে নির্বিচারে !

এরপর অনিবার্য মেঘে-মেঘে বিদ্যুৎ-প্রবাহ
ফণা তুলবে ; সেই দিনও আমাকে বাজাতে হবে বাঁশী
এবং যোগাতে হবে জনে-জনে অসীম উৎসাহ—
যেহেতু সমাজবদ্ধ প্রাণী আমি, শান্তির পিয়াসী !

এ-দেহ গলিত শব ; কিন্তু সূর্যমুখী যে চেতনা,
তার মর্মে জাহ্নবীর ধারা এসে ঢলে পড়ে যদি
তাহলে জটার জাল, স্থিতি, মুক্তি, চলার প্রেরণা
বাঁচার মহৎ পথে আমাকে চালাবে নিরবধি ॥

চড়াই দুটো : মানুষ দুটো

চড়াই দুটো এখনো সেই আদিম ভাষা-ভাষী ;
খড়-কুটো আর আবর্জনা এনে বানায় ঘর,
বংশ রাখে, জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে অবিশ্বাসী—
বৃদ্ধা পৃথিবীকে চেনার পায়না অবসর !

আরামপ্রদ উঁচু প্রাসাদ, ঐশ্বর্যে ঘেরা ;
আলো, আরো-আলোর ব্যাপ্ত বৈদ্যুতিক পাখা
স্বচ্ছন্দে এড়িয়ে আজো ওদের চলা-ফেরা—
আলোর ভয়ে ভেন্টিলেটার বন্ধকরে রাখা !

এই দুর্লভ মানব-জন্ম, সব সৃষ্টির সার ;
গুহার পরিবর্তে এখন উঁচু দালান-কোঠা,
ফোন, রেডিও, টেলিভিশান, রেফ্রিজারেটার—
রাত্তির দিন মাটি মায়ের ধন-ভাণ্ডার লোটা !

মানুষ দুটো আরো-আলোর তবুও প্রত্যাশী ;
ভেন্টিলেটার-বন্ধ ঘরে যা পাওয়া দুষ্কর !
চড়াই দুটো এখনো সেই আদিম ভাষা-ভাষী—
বৃদ্ধা পৃথিবীকে চেনার পায়না অবসর ॥

পৌরুষ প্রসূত

নিত্যনৈমিত্তিক ঢঙে চির প্রচলিত কথা বলা!

ছোটো-খাটো দুঃখ, গ্লানি, ভয় তুমি এড়াতে পারোনা?
পারোনা কি খুঁজে নিতে জীবনের মহত্তর মানে?
কিংবা পরিপূর্ণ কোনো জীবনবোধের সন্নিধানে
পারোনা জড়াতে তুমি নিজেকে? নিষ্কাম আরাধনা?

পৌরুষ প্রসূত প্রেম ধারণে অক্ষম ছলা-কলা!

শুধু কি আহার, নিদ্রা, মৈথুন ত্রিধারা সন্নিপাতে
জীবন? এবং জন্ম আর মৃত্যু ; জন্ম-মৃত্যু আর
জন্মের, মৃত্যুর ফাঁকে ক'টি দিন যথেচ্ছ বিহার—
তবে তো সমস্ত সৃষ্টি ব্যর্থ পর্যবসিত গোভাতে!

তুমি কি আবার চাও, সব্যসাচী হোক্ বৃহন্নলা?

যদিও অনেক দূরে চলে এসে চিনেছো সংসার ;
শিখেছো কি, আদি অন্ত কালের মধ্যস্থ অগণিত
যন্ত্রণার পরিভাষা? দেখেছো কি, এই দেহে মৃত
বহু পূর্বপুরুষের রক্তের ধারার সমাহার?

নতুবা ব্যাহত হবে উদ্বর্তন-সেতু বেয়ে চলা!!

এই অন্ধকার-আলো

এখনো তোমার ঘরে দুর্বিসহ ধোঁয়ার কুণ্ডলী,
মৃত্যুর বিষাক্ত বীজ !
মমতায় আমি যতো বলি—
এ-ঘরে আলোর কোলে, বহমান বাতাসের বুকে
স্নেহে, প্রেমে চলে এস ; কেন যে ধোঁয়ায় ধুঁকে ধুঁকে
নিজেকে নিঃশেষ করো !
—ততোই নির্লিপ্ত মন খুলে
ও-ঘরের অন্ধকারে হেসে ওঠো সহজাত ভুলে !

এ-ঘরে, আমার ঘরে, হাওয়া-আলো মিলিত বিলাস ;
এ-ঘরে হাওয়ায় নেই দুর্বিসহ ধোঁয়ার নিশ্বাস,
এ-ঘরে আলোয় নেই ও-ঘরের অন্ধকার-ভীড়—
এ-ঘরে তোমার নেই আনাগোনা !
তোমার শরীর
অন্ধকারে অবরুদ্ধ !
—অথচ আমার প্রিয় ঘর
কিছু অন্ধকার মেখে আজো হতে পারেনি প্রখর !

এই অন্ধকার-আলো যাকে জন্ম দেবে যন্ত্রণায়—
সে শান্তি, সমগ্র সত্তা আছে তার লুব্ধ প্রতীক্ষায় ॥

বৈষ্ণবীয়

ধোঁয়ার কুণ্ডলী, মৃত্যু, ব্যভিচার ক্রমশ নিঃশেষ ;
অধর্ম সরিয়ে দেবো প্রেমের পবিত্র অশ্রু পাতে—
এ-সংসারে তার সম্ভাবনা অনুযায়ী পরিবেশ
প্রস্তুত হলেই তাকে দেখা যাবে আসন্ন প্রভাতে !

কে সম্রাট, কে ভিখিরী ? এবং তখন স্বাভাবিক
জীবনের স্রোতে হবে পরস্পর নির্বিরোধ সব,
ন্যায়দণ্ডে বাঁধা রবে সমাজদ্রোহী ও কাপালিক—
এই বলে থেমেছেন প্রাজ্ঞ অনুভূতির বৈষ্ণব।

দিনে দিনে বন্ধ্যা হয়ে, ব্যর্থ হয়ে দিন চলে যায়—
সেদিন আসেনা আর ; প্রতীক্ষার শিখা জ্বলে শেষ
মানুষের চোখে, শুধু লালিত ভক্তের কল্পনায়—
এ-সংসারে তার সম্ভাবনা অনুযায়ী পরিবেশ !

সে প্রাজ্ঞ বৈষ্ণব, আর্ষ-উক্তি যা একান্ত দৃঢ়তায়
রেখেছেন, তা কি সত্যি ? সবই নির্বিরোধ, স্বাভাবিক
জীবনের স্রোতে ? এই নব নবদ্বীপ-মোহনায়
ন্যায়দণ্ডে বাঁধা আছে সমাজদ্রোহী ও কাপালিক ?

নারী, সুরা, শব নিয়ে সাধনায় রক্তপংক রাত
হে প্রাজ্ঞ বৈষ্ণব, কই, কতো দূরে আসন্ন প্রভাত !!

অন্ধকারে

অন্ধকারে জর্জরিত, রাত-জাগা পাখি,
কবি,
আর কতো কাল
বসে রবি
এ-ভয়াল
রক্তমাখা বিনাশের শিবিরে একাকী?

ওই তো ঘুমিয়ে যোদ্ধৃদল,
শুধু তোরই নেই
ক্লান্তি। এই দেহের অতীত
সেই
এক সত্তা এবং সম্বিৎ
তোকে বুঝি করেছে বিকল?

কী করে এড়াবি পরিপূর্ণ প্রকৃতিকে।
কর্ম, কথা, জীবন-দর্শন
ঋতুতে-ঋতুতে
পল্লবিত, সারারাত কী যে আকর্ষণ
কেন্দ্রীভূত অচ্ছেদ্য বিদ্যুতে—
যতক্ষণ-না আলো ফুটে ওঠে দিকে-দিকে

যোগ্যতম

জ্বলন্ত ঈর্ষার কুণ্ডে, কে বলে, নিশ্চিহ্ন হতে পারেনা মানুষ ?
বেঁচে থাকবে যোগ্যতম ; মানব-যোগ্যতা যতো, সব সংক্রামিত
দানবীয় সভ্যতায় ! নিষাদের তীক্ষ্ণশর, বর্বরের ক্রুশ
বিবর্তিত হয়ে হয়ে পারমানবিকতার শৌর্যে প্রতিষ্ঠিত !

আত্মহননের মন্ত্রে দীক্ষিত এ-যুগ । সব ওষুধে এখন
অনাস্থা ! অস্বাভাবিক বেড়ে-ওঠা সভ্যতার নাভিশ্বাসে আমি
নাড়ি ধরে বসে আছি—প্রতি দিন অবিশ্বাস্যভাবে অধোগামী
জীবন যাত্রার পথে মুমূর্ষু এ-দাম্ভিকের প্রাণের স্পন্দন ।

নিজে চিরজীবী—এই মোহের পালংকে আজ ঘুমিয়ে পড়েছে
বৈজ্ঞানিক, জল্লাদের নির্লিপ্ততা মুখে ! আমি ঘুমোতে পারিনে,
তৃতীয় চোখের জল জীবনের সঞ্জীবনী ধারা চিনে চিনে
বয়ে চলে ; পৃথিবীর কেউ কি কোথাও আর থাকবে প্রাণে বেঁচে ?

সৃষ্টির মর্মার্থ ব্যর্থ বিজ্ঞানের জ্ঞানহীন প্রতিযোগিতায় ;
যোগ্যতম পঞ্চভূত বেঁচে থাকবে মানুষের কবরে, চিতায় ॥

পিতৃত্ব

মেয়েটার ভীষণ অসুখ!
জ্বরে জর্জরিত কচি গাল—
রক্তহীন ঘর্মাক্ত কপাল,
ফ্যাকাশে, বিষণ্ণ চোখ-মুখ!

নিশাচর চোরের মতন
ঘুমন্ত-গভীর রাতে ফিরি—
এ-জীবন অসহ্য বিচ্ছিরি,
ভয়ানক অবসন্ন মন!

কতোটুকু সাধ্য, শক্তি আছে?
অক্ষম পুরুষ, জন্মদাতা
প্রকৃতির বিধানে! বিধাতা
কী নিদানে বিশ্বাসী? ও-মেয়ে
নাখেয়ে, কুপথ্য কিছু খেয়ে
বিনা ওষুধেই যদি বাঁচে॥

আসন্ন প্রসবার ভাবনা

কবিতা, সংগীত, কথা—সমস্ত সংহত একাকার ;
এ-মুহূর্তে কিছু যেন মূলতঃ বিচ্ছিন্ন নয় আর—
পূর্ণ শুভ্র কবি রবি ঠাকুর একক ! আমি কোনো
সাধনায় সিদ্ধ নই—আরাধনা তা বলে এখনো
থামেনি ; পৃথিবী, সৌর-জগৎ জানার কৌতূহল
এবং বিবিধ ব্যথা কায়মনে বোঝার কৌশল
শিখেছি অথচ চোখে ঘুম আসে—ক্লান্ত আমি, মাগো,
সে এলে, যথার্থ লগ্নে ডেকে দিতে একা তুমি জাগো।

যার জন্ম-লগ্নে তুমি জেগে ছিলে, তাব জন্মান্তবে
জেগে থাকো পুনর্বার ! আসন্ন জীবনপ্লাবী ঝড়ে
যন্ত্রণার শিখা জ্বলে ; কবিতা, সংগীত, কথা—সব
জন্ম দিয়ে আমাদের জীবনেব চরম গৌবব
সুতরাং মা, আমার মাতৃত্বে তোমার রমণীয়
সৃষ্টির বিকাশ—আমি ঘুমোই ; সে এলে ডেকে দিও ॥

তিনটি শিশুর মা ও চতুর্থ যুবক

তিন-বার মৃত্যুর ব্যূহে আটকেও কি পেটের আগুন
এখনো জ্বলন্ত ওর? প্রাত্যহিক বাঁচার তাগিদে
ও যেহেতু চায় অন্ন বস্ত্র—তাই যৌবনের কূল
নিয়তই ভেঙে নেয় ভয়াবহ পাশবিক স্রোত।
অন্নদাতা দানবেরা ওর গর্ভে দেবতার ভ্রূণ
গচ্ছিত রাখার পরে মেটায় পেটের কিছু খিদে:
অন্ধকারে কে তুমি, কে সাহায্যার্থে এসেছ? যে ভুল
মারাত্মক, করবে ফের তা দিয়ে মৃত্যুকে অবরোধ?

পৃথিবীর ভবিষ্যৎ, তিনটি শিশু ওই দ্যাখো ওদিকে
ফুটপাতে, ধুলায় কাঁদে। তিনটি যুবকের শক্তিশেলে
মৃত্যু ছাড়া আর যা এলো, চতুর্থ যুবক তুমি তার
নিরাপত্তা চাওনা কি? তা হলে মুমূর্ষু যুবতীকে
নাজ্বালিয়ে ওরই তিনটি জীবনে উত্তাপ দাও ঢেলে—
প্রচলিত পথে ওরা মাকে ফিরে পেতে চায়না আর॥

অন্ধকূপে

অব্যক্তাদিনী ভূতানি ব্যক্ত মধ্যানি ভারত।
অব্যক্ত নিধনান্যেব কা কস্য পরিবেদনা॥

ব্যর্থ আয়োজন! শুধু দেহে-মনে দুঃসহ যন্ত্রণা—
এ-ছাড়া সে কী পেয়েছে? ক্রমশ ফলের আবির্ভাবে
শুকিয়ে এসেছে ফুল তিলে তিলে। জৈবিক মৃত্যুকে
এড়িয়ে জীবাশ্ম-প্রাণ বিড়ম্বিত আর-এক জীবন
এখন ধারণ করে। যে জননী দুঃস্বপ্নে আন্‌মনা,
ঐশ্বর্য বিলুপ্ত যার—দীর্ঘ নিঃশ্বাসের তীব্র তাপে
জ্বালায় সংসার, জ্বলে সে নিজে! হে ব্রহ্মা, কী যে সুখে
মৃতবৎসা জীবকোষে জীবনের জাগাও স্পন্দন!

পূর্বজন্ম, পরজন্ম—অন্ধকার, অন্ধকারে থাক্।
এ-জন্ম যেটুকু সত্যে প্রতিভাত তার বিশ্লেষণে
মনে হয় : সত্য-শিব-সুন্দর কদর্যতম রূপে
বিষাক্ত করেছে সব। ঘরে ঘরে যন্ত্রণার শাঁখ
বাজিয়ে মানুষ ক্লান্ত অথচ নিয়ত মনে মনে
নিজেকে অজ্ঞান ভেবে সান্ত্বনা যোগায় অন্ধকূপে॥

প্রেমের সম্রাট

পাশবিক চিন্তার প্রবাহে
বন্ধুত্ব যে ভাঙলো, বৃথাই
সে একদা বলেছে উৎসাহে—
হিন্দী আর চিনী ভাই-ভাই।

জীবনের ব্যসনে, উৎসবে,
দুর্ভিক্ষের দুর্দিনে, শ্মশানে,
রাজদ্বারে ও রাস্ট্র বিপ্লবে
সংগী যে, কে তাকে মারে প্রাণে।

শান্তি-পর্ব, সহ-অবস্থিতি
ভুলায় যুদ্ধের আঁট-ঘাট,
তা বলে কি জীবনের নীতি
ভুলে যায় প্রেমের সম্রাট ??

না, আমরা চাইনি যুদ্ধ

না, আমরা চাইনি যুদ্ধ ; কেন তবু যোদ্ধাদেরই মতো
অস্ত্র হাতে নিয়ে আজ নির্মম হয়েছি রাতারাতি ?
এ-কলম হাতিয়ার, দুর্দিনে অভয়দাতা, সাথী—
এ-হৃদয় স্বতঃস্ফূর্ত বিস্ফোরক যন্ত্রে পরিণত !

আমার সংসারে কৃচ্ছ্রসাধনার ব্রত, স্ত্রী হাতের
যা কিছু সম্বল, তুলে দিচ্ছে প্রতিরক্ষার্থে। বারুদ
সোনার চেয়েও দামী : আসলের চেয়ে মিষ্টি সুদ—
এ-যুদ্ধ থামলেও টিকে থাকবে অবাঞ্ছিত যুদ্ধ-জের !

অগণিত সমস্যায় জর্জরিত সমস্ত পৃথিবী !
আমরা কবি, সে-সবের হিসেব মেলাতে নাজেহাল ;
এরই মধ্যে কে কুচক্রী স্বাধীনতা-হীনতা-জঞ্জাল
ছড়াচ্ছিস ? ভেবেছিস, হাতের কলম কেড়ে নিবি ?

কলমে জীবন আর জীবনের পক্ষে মানবতা ;
আমরা শুধু শান্তি চাই—শান্তি-প্রেম, শান্তি-অমরতা।

সমাজ-সভ্যতা

অনর্থক এই সব মানুষের সংগে মেলা-মেশা।
জ্ঞানের সমুদ্র ঘিরে সপ্ত-ডিঙা বেয়েছি অনেক—
মানুষের অবয়বে প্রাণী, মানবেতর ব্যতীত
অন্য কোন অভিজ্ঞতা হল না ; চাঞ্চল্যকর নেশা
কতো আর ভালো লাগে জ্ঞানবৃদ্ধ সমাজে ! বিবেক
মানুষের মানসিক দৈন্য-দশা দর্শনে স্তম্ভিত !

নিম্ন-বিত্ত, মধ্য বিত্ত, উচ্চ-মধ্য-বিত্ত ও ধনিক—
নানাবিধ বন্ধু আছে—সকলেরই বাড়ী মাঝে মাঝে
গিয়েছি, দেখেছি—পদদলিত মনুষ্যত্ব বার বার !
উত্তর মেরুতে শীত ভয়াবহ, শীত সর্বাধিক
দক্ষিণ মেরুতে—সবই জীবনের প্রতিকূলে ! কাজে,
ব্যবহারে, ব্যবহারে তেতো এঁটো সমাজ সংসার।

সুলভ বন্ধুই বেশী—তারা বড় স্বার্থপর, আর
সুদুর্লভ কামনার আসঙ্গে বেহায়া ; নানা রোগে
ভুগে মরে, অন্ধকারে মিটমিটে তারাকে মনে করে
দিনের প্রখর সূর্য ! সুতরাং জানি—বুদ্ধি কার
কতোটুকু, কে কতোটা পাকা যোগী জীবনের যোগে :
আসলে নির্দ্দিষ্ট জ্ঞানে সকলে আবদ্ধ ঘরে ঘরে।

এ সমস্ত জানা হলে পৃথিবীকে অভিশাপ দিয়ে
চলে যেতে ইচ্ছে হয় ! না জানা বোধ হয় ঢের ভালো :
রুটি খেয়ে, ফুটপাতে ইটের বালিশে চীৎপাত
শুয়ে পড়ে ঘুম কিংবা ধর্মীয় আমোঘ অস্ত্র নিয়ে
নেচে কুঁদে চাঙা হয়ে পশুর মতন কালো কালো
অন্ধকার পাহাড়ের গুহায় কাটানো সারারাত।

স্বোপার্জিত কুশিক্ষায় রাতারাতি বেড়েছে মানুষ ;
কী ধনে যে ধনী বিংশ-শতাব্দীর শেষার্দ্ধ-সমাজ !
ঝুলি-কাঁথা ঝেড়ে দেখি, কাণা কড়িটাও আর নেই ;
নিষ্কর্মি ভৌমিক, রায় চৌধুরী বংশের তবু হুঁশ
হয়নি এখনও ! আহা, এ-সব দেখেই আমি আজ
বদ্ধ পাগলের মতো চিন্তায় হারিয়ে ফেল্‌ছি খেই !

শ্রেষ্ঠত্বের দাবী নিয়ে, শিল্পীর দুচোখ খুলে এই
পৃথিবীর বুকে ঘুরে কী পেলাম, কী আছে পাওয়ার ?
অনেক দেখেছি, আর অনেক জেনেছি, যার দাম
যে কোনো শিশুও পারে দিয়ে দিতে অতি সহজেই :
এ-যুগের ইতিহাসে সমস্ত বৈচিত্র্য একাকার—
আকবর বাদ্‌শার পাশে হরিপদ কেরাণীর নাম ॥

মানুষ : মাটি

মানুষ মটিকে ভালোবাসে—
মাটির জন্যেই হানাহানি ;
মানুষ বাসেনা ভালো তার
সহগামী মানুষকে, তাই
মানুষের রক্তে-রক্তে ভাসে
মাটির পবিত্র অংক ! জানি—
মাটি মানুষের প্রেম আর
চাবেনা, দেবেনা বুকে ঠাঁই !

মানুষের জন্যে মাটি—এই
সত্যকে জেনেছি এতো দিন ;
এখন নতুন করে দেখি—
মানুষেরা মাটির জন্যেই,
মূল্যবান মাটি ; অর্বাচীন
মানুষ একান্তভাবে মেকী ॥

শিল্পীর বিবেকে

পরিবর্তনের ঝড়ে কিছু গাছ-পালা ভেঙে যায়,
বাকী সব কোনো মতে টিকে থাকে ; তা থেকেই ফের
প্রকৃতির সাহচর্যে নিয়মিত গাছেরা জন্মায়—
এই পথে উদ্বর্তন-ধারা বয়ে চলেছে প্রাণের !

সুপরিকল্পিত কিছু হিংস্রতার, দস্যুতাব হাতে
মানুষ লাঞ্ছিত, তার সভ্যতা বিপন্ন ! স্বভাবত
সেই সব হিংস্র-দস্যু অবশ্যই যুগের সংঘাতে
স্বধর্মে স্ববংশে ধ্বংস হয়ে যাবে, সে-দিন আগত !

অনিবার্য রক্ত-স্রোত প্রবাহিত হবে পৃথিবীতে,
পরিবর্তনের ঝড়ে কিছু গাছ-পালা ভেঙে যাবে ;
মানুষ নিহতপ্রায়, এরই যোগ্য প্রতিশোধ নিতে
মুমূর্ষু প্রাণের বীজ অগণিত জীবনে মেলাবে !

আসেনা নিশ্চিত শান্তি তীব্রতম ঝড় ব্যতিরেকে—
সে-সংহত শক্তি-স্রোত প্রবাহিত শিল্পীর বিবেকে ॥

উৎসবের অন্য প্রান্ত থেকে

মামুন, আমি ঘুমোবার সংকল্প করেছিলাম—কিন্তু ঘুমোতে পারিনি বলেই এখন তোকে চিঠি লিখ্‌ছি। তোর মা কাছে না-থাকলে আমি অসহায় হয়ে পড়ি, তোর দাদার উদ্ভট দুষ্টুমির যন্ত্রণা ভোগ না-করলে আমার মন অসাড় হয়ে যায়; আর তুই আমার কাছে না-থাকলে কেমন যে লাগে—তা আমি আজকে এই মুহূর্তে এই চিঠিতে ব্যক্ত করার উপযুক্ত ভাষাই খুঁজে পাচ্ছিনে। আমার প্রতিভা সব হারিয়ে গেছে!

ভেবেছিলাম, আজ একটা গল্প লিখ্‌বো; গল্পের প্লট, স্টাইল তাল-গোল পাকিয়ে গেল। ভেবেছিলাম, ঘুমোবো, ঘুম আসেনি; এখন চিঠি লিখ্‌ছি। তোর মাকে নয়, দাদাকেও না; তোকে লিখ্‌ছি, অথচ তুই পড়তে শিখিসনি এখনও। তোর মা তোকে এই চিঠি পড়ে শোনাবে; তুই এর কোনো অর্থই বুঝবিনে। কেন যে লিখ্‌ছি, তার অর্থও আমি নিজে বুঝিনে। আজ আর নিজেকে তীক্ষ্ণধী ভাবার সাহস নেই!

একদিন তো নিশ্চয়ই আমরা সবাই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবো: কেউ আগে, কেউ পরে; কে কোথায় যাবো তা কেউ জানিনে। কার কেমন লাগ্‌বে সেদিন? আমি তো মোটে ভেবেই পাচ্ছিনে—এসব সাজানো সংসারের মানেটা কী? এসব উচ্ছ্বাসের উৎস কোথায়? আর এই মনের মানুষ, প্রাণের মানুষ এবং নিজের মানুষ, এরা কে কোথায় ছিল, পরে কোথায় চলে যাবে, গেলে কী হবে! আহা আমি কি তবে পাগল হয়ে গিয়েছি?

উৎসবের হুল্লোড়ে তোরা সাময়িক ভাবে ভুলে রয়েছিস আমাকে। এটা খুবই স্বাভাবিক। অভিমান করছিনে,

আমি তো আর শিশু নই! অনেক বছরের অভিজ্ঞ; অনেক, অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝায় ডানা ভেঙে গিয়েছে। অথচ বিশ্রাম নেই, সময় নেই কোনো উৎসবে যোগ দেওয়ার। এ-জীবনে উজ্জল আলোর স্বপ্ন বৃথা! অন্ধকারের দিকেই থেকে যেতে হল; তোদের জীবনে যেন উৎসবের দিনগুলি চিরস্থায়ী হয়!

তোর মায়ের প্রিয় কলমটা দিয়ে এই চিঠি লিখ্‌ছি, তোর দাদার খাতার কাগজ নিয়ে; বুকের কাছে রয়েছে তোর ছোট্ট বালিশটা। এই রাত শেষ হয়ে যাবে। কাল সকালেই আবার আমি হাজার কাজের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেল্‌বো, ভুলে যাবো তোদের কথা; এ চিঠিটাও হয়তো পোষ্ট করা হবেনা। রাত আস্‌বে ঘুরে; ঘুমোতে পারবোনা। হাজার জ্বালায় জ্বলে আবার নতুন করে তোকে চিঠি লিখ্‌তে বসবো॥

অমিল

স্তব্ধ সমাধির কোলে শুইয়ে দিয়েছি এক দিন
বন্ধুদম্পতির সেই সদ্যোজাত শুভ্র শিশুটিকে।
অজস্র শিশুর স্মৃতি-সৌধ ঘিরে প্রতি সন্ধ্যা বেলা
কতো যে প্রদীপ জ্বলে, কতো ফুল নিত্য জমা হয়।

এই তীব্র কোলাহল মুখর শহর থেকে দূরে
কী নির্জন সেই তীর্থ! যেখানে শিশুরা করে খেলা
জ্যোৎস্না রাতে, আকাশের চাঁদের মতন হাসি মুখ—
আমাদের অশ্রুসিক্ত মিনতি শোনেনা তারা আর!

এখন গভীর রাতে সমাধিস্থ হৃদয় আমার।
মনে হয়—মায়েদের স্নেহ প্রীতি ফুল এতক্ষণে
সমস্ত শিশুরা মিলে ভাগ করে নিয়েছে এবং
হাতে হাত ধরে তারা ঘুরে ঘুরে নেচেই চলেছে!

এই জ্যোৎস্না রাতে যেন শিশু হয়ে গিয়েছি আমিও,
কবে যে কোথায় ফেলে এসেছি শৈশব, মনে নেই!
অজস্র ফুলের বুকে শিশিরের বিন্দু টলমল—
অস্থায়ী জীবন-দীপ, বৃদ্ধ হবো, ফের শিশু হবো?

শিশুর কাঙাল বন্ধুদম্পতিও বৃদ্ধ হয়ে যাবে,
শিশুটি শিশুই রবে চিরকাল সমাধির কোলে॥

রেলপথ

পৃথিবীর রেলপথ ঘুরে
দেখেছি, সামান্য দূরে দূরে
মৃত্যুন্মুখ প্রতি তালগাছে
অসংখ্য শকুন বসে আছে !

শেয়াল, কুকুর এই সব
ইতর পশুর কলরব,
শকুন পাখীর লোলুপতা—
সংসারেব সহজাত প্রথা !

এবং মাংসের প্রলোভনে
জীবন উন্মত্ত। মনে, বনে
সর্বত্র বিভেদ, হানাহানি—
নিষ্কলুষ নয় কোনো প্রাণী !

তাই, পশু-পাখীব নিয়মে
মানুষেরা পুরুষানুক্রমে
মানুষেব মাংস-লালসায়
মানুষকে বিপথে চালায়।

এই রেলপথ চলে গেছে
প্রতি ঘবে ! আলোয় বেঁধেছে
চতুর্দ্দিক ; তবু অন্ধকাব
কাটেনি মানব সভ্যতার।

পৃথিবীর রেলপথ ঘুরে
দেখেছি, সামান্য দূরে দূরে
মৃত্যুন্মুখ প্রতি তালগাছে
অসংখ্য শকুন বসে আছে !!

প্রসব-লগ্নে

মানুষের জন্ম কী ভাবে? যে ভাবে
কবিতার? প্রসব-লগ্নে কেউ যেন
কাছে নাথাকে। কী বীভৎস যন্ত্রণা
আর লজ্জা! পুরুষ আর প্রকৃতি
অত্যন্ত বেহায়া। এবং মনে হয়
ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান—যে যা
খুশী, বলুক, মানুষের জন্ম-রহস্য
মানুষ জানেনা—কবিতার মতোই।

যতক্ষণ যৌবন আর প্রজনন-ক্ষমতা
মানুষের রয়েছে, ততক্ষণ সে স্রষ্টা
কেননা সৃষ্টির রহস্য একই, নতুবা
কবিতা লিখবার সময় কেউ আমার
কাছে থাকলে লজ্জা পাই কেন? আহা
প্রসব-লগ্নে কেউ যেন কাছে নাথাকে॥

অন্ধকার ঘরের কোণে

আমি আর সিগারেট খাবোনা। কেননা সিগারেটের ধোঁয়ায় অনেক কবিতা পেঁচিয়ে ওঠে, আর অনেক চেনামুখ যায় গুলিয়ে, এবং অনেক স্মৃতির কাঁটা ভোঁতা হয়ে যায় সুতরাং খাবোনা আর সিগারেট।

সুদেষ্ণার জামাটা ছিঁড়ে গেছে। বুলুর জুতোজোড়া মুচি দেখাতে হবে। গীতার স্কুলের মাইনেটা যদি মকুব করানো যায়—সেক্রেটারীকে বলে! আমি তো বর্তমানে ভালোই আছি। তোমার শাড়ী এ-মাসে নয়।

কাকে ধরলে তোমার চাকরীটা হতে পারে, তুমি তা জানো? বাংলা দেশের নামজাদা, জনৈক জাঁদরেল পলিটিক্যাল ফিগার, দুশ্চরিত্র, কিন্তু ভদ্র; যিনি কাল আসছেন পাড়ার লাইব্রেরীর উদ্বোধন করতে।

আমি আর সিগারেট খাবোনা। কেননা সিগারেটের ধোঁয়ায় দুশ্চরিত্র লোকটিকে চিনতে তোমার কষ্ট হবে॥

ভাবানুষঙ্গ

'অবিচার, ব্যভিচার—দেখেছো, সয়েছো বারবার ;
প্রকাশের ভাষা নেই, এই অক্ষমতার আঘাতে
বিমূঢ়, আত্মস্থ তুমি কবি ; তবু স্বার্থান্ধ সবার
ব্যথায় উদ্বেল, ক্লিষ্ট তুমিই তো অন্ধকার রাতে !

তোমার সমস্ত সত্তা বিচ্ছিন্ন করার আয়োজন
যখন, তখনো তুমি নির্লিপ্ত, সস্নেহে বলো কথা ;
এই সব অবাঞ্ছিত মৃত্যুতে কি আত্মসমর্পণ
সম্ভব তোমার ? নও ভীতু ; শুধু স্পর্শ-কাতরতা ।

ঘুমের আহ্লাদ ভুলে গেছো তুমি, ঘুমের আহ্লাদ
গেছো তুমি ভুলে, তুমি ঘুমের আহ্লাদ গেছো ভুলে
মানুষে মানুষে কতো বিসম্বাদ, কতো বিসম্বাদ
মানুষে মানুষে—কতো বিসম্বাদ জীবনের মূলে !

তোমার সত্তায় কতো প্রত্যক্ষ সত্যের সমন্বয় ,
বিমূঢ়, আত্মস্থ তুমি কবি, দার্শনিক, মৃত্যুঞ্জয় ॥

ঐতিহ্যাশ্রয়ী

বাল্মিকী-ব্যাসের চিত্ত—রামের, কৃষ্ণের লীলাভূমি।
সীতা, রাধা চিরকাল সার্থক যুগলে, প্রেমানলে
প্রজ্বলিত। লঙ্কাকাণ্ডে, কুরুক্ষেত্রে যা দেখেছো তুমি
তারই অভিজ্ঞতা আজো অন্ধকারে দীপ হয়ে জ্বলে!

শব্দ-ব্রহ্ম-সংগীতের সূত্রে তাই বাঁধা পড়ে আছো;
মহাকবি বাল্মিকী ও বেদব্যাসের কণ্ঠস্বরে
অন্তর উদ্বেল, তুমি শেকড়ের শক্তি নিয়ে বাঁচো—
যে শেকড় চলে গেছে আত্মার গভীরে, অগোচরে॥

মনে পড়ে যায়

একটি মেয়ের মুখ চির দিন ভাসে
আমার দুচোখে।
কতো
অনায়াসে
তার ভালোবাসার আলোকে,
ক্রমাগত
আমি চলি পৃথিবীর পথ!
বারবার
শীর্ণহাতে
সে আমার
পৌরুষ পর্বত
কাঁপিয়েছে জীবনের অন্ধকার রাতে।

প্রাত্যহিক প্রয়োজন কোনো দিন তার
পারিনি মেটাতে
অন্ধকার
রাতে
মনে পড়ে যায় তার কথা,
নীরবতা
মনে পড়ে যায়। টিঁকে আছি
আপন অস্তিত্ব কুঁড়ে খেয়ে
বাঁচি
তার কথা ভেবে ; সেই মেয়ে
চির দিন আমাকে কাঁদায়—
অন্ধকারে তার কথা মনে পড়ে যায়॥

স্নেহ-প্রেম

স্নেহ আছে, প্রেম আছে তবু কেন আজ
নেই
সেই
স্নেহ-প্রেম প্রদানের মানব সমাজ ?

যন্ত্রণায় পরিজন, আনন্দে বান্ধব
সব
ঘর
আছে ঠিক, ঐক্যহীন তবু পরস্পর !

স্নেহ, প্রেম যেন আজ রাহু আর কেতু ;
এই
সেতু
জীবনে জীবন বাঁধে, শান্তি তবু নেই।

আত্মার আত্মীয় নেই, নেই প্রিয়জন ;
মন ?
আছে—
যা নিয়ে মানুষ আজো অন্ধকারে বাঁচে !

পেরোতে অজানা নানা হৃদয়ের ধাপ—
শোকে
চোখে
আসে জল : স্নেহ-প্রেম কী যে অভিশাপ ॥

প্রেম, রাবণের চিতা

পাথর সাগর-জলে ভেসেছিল প্রেমে !
আছে প্রেম তাই আছে প্রাণ,
প্রেমময় জীবন মহান ;
প্রেমহীন হলে বিশ্ব-গতি যায় থেমে ।

পেয়েছি প্রেমের স্পর্শ, যা ছড়িয়ে আছে
সংসারের অসংখ্য হৃদয়ে,
যা নিয়ে চলেছি বিশ্ব-জয়ে—
নিঃশেষে যা রেখে যাবো মানুষের কাছে ।

সীতা-রাধা-বিষ্ণুপ্রিয়া প্রেমের প্রতিমা—
মানুষের মর্মে বহ্নিশিখা ;
ললাটে উজ্জ্বল জয়-টিকা
আঁকে প্রেম, প্রেম ষড়দর্শন-মহিমা !

জননী-রমণী-কন্যা, পুত্র-পতি-পিতা
প্রেমের ইন্ধন ; প্রেম, রাবণের চিতা ॥

ইচ্ছা হলে

নিশ্চিন্ত শান্তির স্রোতে ইচ্ছা হলে ভেসে যেতে পারি,
ডুবে যেতে পারি জ্ঞান-সমুদ্র-গভীরে ইচ্ছা হলে—
ইচ্ছা হলে কী না-পারি ? সংসারের নিবিড় বন্ধন
কেটেছি—বেঁধেছো তুমি যে লগ্নে, নিষিদ্ধ ফলাহারী
এ-আমাকে।   ছি-ছি, স্ত্রৈণ পুরুষ্ ভেবোনা—যাবো চলে
সব ছেড়ে, তাই আজো অসম্পূর্ণ আত্মসমর্পন।

সৃষ্টির রহস্য ঢের জানা হল।   ব্যথার সার্বিক
আনন্দে বিমুগ্ধ আত্মা—মর্মে কষ্টার্জিত অভিজ্ঞতা,
ব্যথা ও আনন্দ—সব সংরক্ষিত বোধের অনলে
পুড়ে পুড়ে খাঁটি হল : এ-জীবনে শান্তি সর্বাধিক
এবং আমার মনে নেই আর কোনো আবিলতা—
তোমার গোপনতম ইচ্ছার ইন্ধন বৃথা জ্বলে।

প্রাণ-ধর্মে যেহেতু জ্ঞানবৃক্ষের নিষিদ্ধ ফলাহারী—
নিশ্চিন্ত শান্তির স্রোতে ইচ্ছা হলে ভেসে যেতে পারি॥

অপচয়ী শক্তি-শেল

অপচয়ী শক্তি-শেল ! যা, ফিরে যা উৎস-মুখে ! আমি
নেবোনা, নেবোনা তোকে এই যন্ত্রণাতীত সত্তায় :
যা তুই সমান বেগে বিপরীত প্রান্তে পুনরায়—
প্রেরকের মর্ম্ম চিরে হয়ে যা স্বধর্মে অধোগামী !

আকাশে আঘাত দিচ্ছে, ফসিলে আঘাত দিচ্ছে, দিচ্ছে
আঘাত সমুদ্রে ; তুই আকাশ, ফসিল আর এই
সমুদ্রে অযথা কেন প্রতিহত ! নেই, ঠাঁই নেই—
আকাশ, ফসিল আর সমুদ্র ফেরাবে তোকে দিচ্ছে !

ওপরে আকাশ আর অন্তরে ফসিল, পদতলে
সমুদ্র—সদিচ্ছাক্রমে নীলকণ্ঠ আমি বিষে-বিষে :
জানিস, আমার ধ্যান কী বস্তুতে ভাঙে ? আর কীসে
তীব্র ব্যথা ? প্রেমে, প্রেমে, শুধু প্রেমে কবি-সত্তা গলে !

আকাশ, ফসিল আর সমুদ্রের সন্নিপাতে আমি
কবি ; তুই অপচয়ী শক্তি-শেল, উৎসে অধোগামী ॥

উত্তরাধিকার সূত্রে

জনক, জননী আর সামাজিক নানা অভিজ্ঞতা
মন্থনের ফলশ্রুতি আমার এ-দেহ, মন, আমি
সুতরাং সমাজের ভবিষ্যৎ সন্ততিকে যদি
কিছুই না-দিয়ে যাই, তাহলে যে ঋণী থেকে যাবো।

জীবন-দর্শন-বীজ বুনে রেখে সযত্নে, প্রত্যহ
নিরাপত্তাবিধানের যা কিছু দরকার—ক্রমান্বয়ে
খুঁজে আনি, তারপর অমৃত-রসের স্নিগ্ধধারা
সস্নেহে সিঞ্চন করি তোমার মাতৃত্ব-সত্তা ঘিরে।

আমি কবি, সর্বসহা প্রেয়সী, প্রত্যক্ষ কোরো তুমি
আমার কবিতা, গান—উত্তাপ, বাতাস, আলো, জল
সর্ববিধ উপাদান, তোমার পবিত্র জীবকোষে
নাড়া দেবে, বীজগুলো ভ্রূণ হবে সাঙ্কুর তাগিদে।

সংখ্যাতীত সন্তানেরা এই বিংশ-শতাব্দী না-যেতে
একান্ত শ্রদ্ধায় দেবে তোমার চোখের জল মুছে,
উত্তরাধিকার সূত্রে তারা পাবে কতো অনায়াসে—
উত্তাপ, বাতাস, আলো, জল—সর্ববিধ উপাদান॥

জীবন-বৃত্ত

আমরা যদি কবিতা না-লিখতাম তাহলে কারো কোনো ক্ষতি হোত?
আমরা যদি ঠিকাদারী, দালালী, ঘটকালী করে দশজনের মতো
অর্থ পরমার্থ ভেবে স্ত্রী-পুত্র-কন্যার স্বার্থে সংসারী হতাম—
তাহলে, জানিনে কারো কোনো ক্ষতি হোত কিনা; জীবনের দাম
কিছু মিলতো! আমরা এই সংসারে বিবাগী কিন্তু সংসার দরদী;
তোমরা বলছো ব্যঙ্গ করে—নিসর্গ-সৌন্দর্যে কারো খিদে মিটতো যদি!

অথচ তোমরাও দেখছি কাব্যি করে বলছো—দ্যাখো, কী সুন্দর চাঁদ!
স্ত্রী বলছে—হ্যাঁ, বুঝেছি, এ দৃশ্যটা এক্ষুনি চাইছো—সংযমের বাঁধ
ভেঙে গ্যাছে; ভণ্ড, ভণ্ড, বেচারী চাঁদটাকে কেন টেনে আনছো বৃথা?
তখনো উস্কাচ্ছো বহ্নি—কাছে, আরো কাছে এস জীবন্ত কবিতা!
অতএব জন্মানো থেকে জন্ম দিয়ে দিয়ে মৃত্যু অব্দি—সব-মিলিয়ে
কবিতা একটাই; আমরা যা লিখছি যুগ-যুগ ধরে বিদ্যা-বুদ্ধি দিয়ে।

দ্যাখোনা—সৌন্দর্য-প্রীতি, সংগম, অশ্লীল অঙ্গোদ্ভূত বংশধর—
সব-কিছুই স্বার্থবহ। অর্থাৎ একটা শক্ত বৃন্তে বাঁধা পরস্পর
কবিতা, রমণী, শিশু; আবর্তিত গতি-গর্ভ, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়
কবিতার মর্মে মর্মে, কবিতা জীবন-বৃত্ত—এ-সত্যে সংশয়
নেই বলেই স্বেচ্ছাক্রমে আমরা ঘুরছি সহজাত কবিতা-প্রভাবে;
তোমরা ভাবছো—অর্থাভাবে কবিতা, রমণী, শিশু বিক্রী হয়ে যাবে॥

থোড়-বড়ি-খাড়া

দশের শ্রমের বৃত্তি লুটে পায় এক মহাজন ;
অন্নহীন, বস্ত্রহীন, ক্রমবর্দ্ধমান সবহারা—
যে শ্রেণী বংশানুক্রমে নিষ্পেষিত, তাদের জীবন
গতানুগতিক খাতে প্রবাহিত, থোড-বড়ি-খাড়া ।

মানুষের জন্মগত অধিকার জীবন ধারণে
অথচ মানুষ কেন মানুষের বুকের পাঁজর
ভেঙে দেয় নির্দ্বিধায় ? সবল দুর্বল নির্যাতনে
উৎসাহী, নির্দ্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত, খাড়া-বড়ি-থোড় ।

দশের জীবনে নেই স্বাধীনতা, একের দাপটে
দশদিক অন্ধকার , তবু ঠিক চলে দামী ধাড়—
সকাল আসন্ন, দেখো সূর্যালোকে, কী-কী গেছে ঘটে,
তারপর ফেলে দিও একঘেয়ে থোড়-খাড়া-বড়ি ॥

নিয়মানুগ

কাঁটায় কণ্টকিত হৃদয়, তাই গোলাপ,
পেলাম সর্বস্বান্তে তোমার স্পর্শ আজ—
মাধুর্য সব নিঙরে দিলে : পাপ্‌ড়ি-ভাঁজ
খুল্‌ছি যতো ততোই নিস্তেজ প্রলাপ !

ধৈর্য, ধৃতি, অধ্যবসায়—এই সবের
মূল্যায়নে, মুগ্ধ জীবন ! রক্ত-রঙ
উপ্‌চে পড়ে : রোমাঞ্চিত মন এবং
দেহের সংগে পাল্লা চলে সাত-অশ্বের !

ধ্যানান্তে নিঃসংগ যোগীর জিঘাংসা
জাগিয়ে কী লাভ ? পেয়েছি যা দিনান্তে—
ভাঙিয়ে পথে এগিয়ে যাবো, কী জান্‌তে
কী জেনেছি—মিট্‌লো জ্ঞানের পিপাসা ?

গোলাপ, হৃদয় কণ্টকিত যন্ত্রণায়
স্নিগ্ধ আবেশ ঢাল্‌ছো প্রাণের অনুজ্ঞায় ॥

যথারীতি

নিঃশব্দে এ-পথটুকু হেঁটে চলো, পরে কথা বল্‌বে যথারীতি !

নির্মম, বিবেকহীন ওরা সব, নির্বিচারে মারণাস্ত্র নিয়ে
প্রস্তুত, মৌলিক স্বার্থে যুক্তিহীন সাংঘাতিক স্বজাতীয় প্রীতি-
বন্ধনে অক্লান্ত ; ভাবছে, তাহলে আসন্ন ঝড়ে যাবেনা তলিয়ে !

তোমার কৃচ্ছ্রতা, প্রেম সময়ান্তে হবে অভিনন্দিত ! এ-পথে
শান্তির সংগীত আজ বাস্তব মন্ত্রের সত্যে দৃপ্ত, নির্ভেজাল—
উন্মত্ত পশুত্ব ধ্বংসী ; উদ্দিষ্ট, দুরধিগম্য প্রশান্ত পর্বতে
দিনান্তে জ্বালাবে তুমি পূতবহ্নি—এতো দিনে পরিপূর্ণ কাল !

কে হাঁটে তোমার পাশে ? চতুর্দ্দিকে বৈদ্যুতিক দৃষ্টি রেখে চলো ;
বিপন্ন বিশ্বাসটুকু যথেচ্ছ বিলিয়ে নিঃস্ব হতে নেই ! কৃতী
প্রহরী কে আছে ? বন্ধু ? অনুচর ? ইশারায় পাশে হাঁটতে বলো

নিঃশব্দে এ-পথটুকু শেষ করো, পরে কথা বল্‌বে যথারীতি ॥

ব্রহ্মাণ্ডবিহারী

যা কিছু তোমাকে স্পর্শ করে যায় তারই কাছে ঋণী
তুমি কবি। কিছু মনে রাখো, বাকি সব ভুলে যাও—
ইচ্ছা করে ভুলে যাও। বিনা প্রয়োজনের বাহিনী
পিষে ফেলে স্বার্থ নিয়ে হতে চাও সম্মুখে উধাও !

আসলে কি নির্দ্বিধায় ভুলে যাওয়া যায় ? জগতের
ভাসমান পসরাকে কারা নেয় চালিয়ে ? দ্বান্দ্বিক
শক্তি থেকে উৎসারিত অনুকূল স্রোত আসে ঢের :
গতি-স্থিতি-অনুসঙ্গে বিদ্যুৎ-প্রবাহ স্বাভাবিক !

তোমার হৃদয়ে নানা আলো জ্বলে, আলো জ্বলে, আলো
তোমাকে দেখায় পথ। সমাজের যতো নর-নারী—
প্রত্যেকের কাছে ঋণী প্রত্যেকেই, তুমিও জোরালো
সামাজিক স্রোতে ভেসে হয়ে যাও ব্রহ্মাণ্ডবিহারী ॥

বারোটা বাজলে

শব্দের তরঙ্গে দোলে অনাদ্যন্ত, শাশ্বত সংসার,
তুমি দোলো, আমি দুলি—আনন্দে দোদুল্যমান স্নায়ু।
সশব্দ সংগীত আর কবিতার বিমুগ্ধ ঝংকার
আমাদের নিদ্রাভঙ্গ আবহে বাড়ায় পরমায়ু।

শব্দের তরঙ্গে দোলে সাম্প্রতিক, নশ্বর সংসার,
ওরা সব দুলে ওঠে—ব্যথায় দোদুল্যমান স্নায়ু!
সশব্দ বিরোধ আর প্রতিরোধ সন্ত্রাস ঝংকার
ওদের দুচোখ থেকে কেড়ে নেয় নিদ্রা, পরমায়ু।

শব্দের তরঙ্গে কাঁপে মধ্যরাত, এখন বারোটা —
ঘণ্টার কাঁটার বুকে মিনিটের কাঁটার স্পন্দন,
এবারে ঘুমোতে চলো বিছানায় · শান্তির পরটা
ওরা সব ভুলে থাক, আমরা চাই আত্মিক মিলন॥

প্রেতের নৃত্যে

গতানুগতিক সহজিয়া ভাবধারা
প্রজনকদের মর্মে দিচ্ছে নাড়া
পসারিণী-রতি-গতি-অভ্যাস-দোষে
সৃজনের কোষে বিষাক্ত বীজ পোষে
ভবিষ্যতের পথের নিশানা যতো
অধঃপ্রয়োগী দুযোগী অবিরত

ছোটোর অন্ধ বড়োরা দ্যাখেনা চোখে
সারমেয় প্রেমে স্বজাতীয় ক্ষত শোঁখে
প্রকৃত দাওয়াই ঢেকে রেখে মজা লোটে
সজ্ঞান-পাপে মিথ্যার খৈ ফোঁটে
আমি ছুড়বোনা অনির্দেশ্য ঢিল
স্বপথে চল্‌বো যা গটুক মুস্কিল

গতানুগতিক ভাবনা তাড়িয়ে আজ
সকী বুন ীর মনের প্রতিটি ভাঁজ
খুলছি অমল সৃষ্টির প্রয়োজনে
টীকা টিপ্পনী ভাষ্য চংক্রমণে
বিলাসীরা কেউ খোঁজেনা বোঝার রীতি
বিরূপ সান্নিপাতিক ত্রিকোণমিতি

যে শিশুটি জাত প্রাণান্ত সাধনায়
আগতকালের আলোর স্বল্পতায়
নিজে সে দাঁড়িয়ে বোঝাবে আমার ভাষা
আপাতবিরোধী হলেও এটুকু আশা
ফলবতী হবে কেননা জীবনবোধ
প্রেতের নৃত্যে মানেনি তো অবরোধ ॥

মনে রেখো

খোকা, তুমি মনে রেখো—প্রতিটি লোকের প্রতি ইন্দ্রিয় সতেজ, সচেতন!
ভেবে-চিন্তে কথা বোলো, কেননা বিশ্বের বুকে যাবতীয় তোমার প্রকাশ
সযত্নে গ্রথিত হচ্ছে সুতরাং চতুর্দিকে স্থির দৃষ্টি রেখো প্রসারিত :
জাগতিক স্থিতি কল্পে একান্তই প্রয়োজন জীবনের আক্রু উন্মোচন,
বাস্তব চাহিদাক্ষেত্রে পর্যাপ্ত বিহার শ্রেয়, তা থেকে এলেও সর্বনাশ
স্বধর্মে উন্নত থাকা বিধেয়—স্বমহিমায় যা কিছু মহার্ঘ, স্বোপার্জিত!

খোকা, তুমি মনে রেখো—পৃথিবীর আবহাওয়া ভয়ানক বিষাক্ত, মলিন,
বালিয়াড়ি-চোরকাঁটা-সাগর-পাথর মিলে নির্বিকারে সব একাকার—
এখানেই ঘুরে ফিরে ঘটে গেছে জীবনের অনেক শতাব্দী-উদ্বর্তন :
তোমাকেও টিকে থেকে শোধ করে যেতে হবে অসহায়া ধরিত্রীর ঋণ :
আপাতমধুর ডাকে, জীবন বিপন্ন কারী ফাঁদে পা-ফেলোনা, খবর্দার,
শঠতা এড়িয়ে যেও—প্রতিটি লোকের প্রতি ইন্দ্রিয় সতেজ, সচেতন॥